প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

উ ৎ স র্গ



চিনুকে

১৬ জানুয়ারি

লেখকের অন্য বই

দুরন্ত দুপুর

সূচীপত্র

সূচীপত্র

তাতারসমুদ্র-ঘেরা

লোকটা

আকাশে সোনার মুখ দেখছে সারনাথে কে নতুন,
ধুলো-পা, আবিষ্ট চোখ, ব'সে থাকে মস্ত নীল মাঠে!
চারদিকে হিম শীত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতাগুণ।
সে যেন পড়েছে লেখা 'অন্ধকার' ভাগ্যের ললাটে।

বিহারে গম্ভীর ঘণ্টা, ধ্বনি গাঁথে নেপাল লাডাক
সিংহল তিব্বত শ্যাম কম্বোডিয়া নম্র-মহাচীন,
এবং স্তূপের পায়ে একা লোকটা। হয়তো একই ডাক
তারও প্রাণ শুনেছিল পদ্মাপারে বিজনে একদিন।

নাকি সারনাথে এসে শিলাকাটা বুদ্ধের অভয়
দেখেছিল মিউজিয়ামে, অভ্যাসবশত লোভী হাত
ছুঁয়েছিল শিল্প-ধ্যান, ছেনিতে বাটালে গড়া জয়?
সে নিজে পারেনি, তার খেদ ক্ষুধা কান্নার আঘাত
রাত্রি জানে? স্বপ্ন জানে?

অথবা মন্দিরে যেতে ফিরে
ধমনীর সব রক্ত আছড়ে পড়েছিল বুকে তার?
মন্থর মেয়েটি তবু মিশে গেছে কুটিল তিমিরে?
এখন পৃথিবীভরা অন্ধকার, শুধু অন্ধকার?

সারঙ্গ উধাও, দীপ্ত মন্ত্রলাগা স্তব্ধ রাত, মাটিলেপা গ্রামে
স্ত্রীপুরুষ ঘরে গেছে: বেণুবনে—সুজাতা কি?—চাঁদ একাকিনী।
অপার আকাশী আলো মূলগন্ধবিহারের সিঁড়ি বেয়ে নামে।
সে পায়নি করুণা যাঁর, প্রভু তথাগত,
কেন এ-লোকটাকে ফেরালেন তিনি!

বিকল্পে উটের সার

বিকল্পে উটের সার, জীবনের গতায়ু বছর।
বালির দুর্গম তাপ, অস্থিসার উপত্যকা,
কঙ্কালকরোটিখসা ঝড়
পায়ে-পায়ে সঙ্গ নেয়। জলের উতলা গন্ধে,
খেজুরের কৃশ ছায়া খুঁজে,
ক্রমশ শুকিয়ে আসে সঞ্চয় যা ছিলো মেদ কুঁজে।

ধ্বংসে পড়ে দিন রাত, আলো ফাটে, ছায়া দীর্ঘ হয়।
শান-দেওয়া অন্ধকারে ক্ষ'য়ে যায় নক্ষত্রবলয়।
তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ :
ভয়ার্ত ত্রিলোক
মানে না মনসার বনে শূন্যে তোলা অভয়মুদ্রাকে।
অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে-যে ফল পাকে।

অঙ্গার পথের ধুলো, আকাশ মূর্ছায়
ঢ'লে পড়ে ডাইনির গুহায়।
এবং ত্রিশূল হাতে দিক দেখায় কপট প্রেতেরা।
বিকল্পে উটের সার
কখনো ফিরবে না আর,
যেহেতু সম্ভব নয় ফেরা,—

যদিও অকল্পনীয় রাত্রিশেষে অন্য কোনো নগরের দ্বার,
বাগানে পাখির গান, ঈশ্বরের ঘুমন্ত সংসার।

দু'টি কবিতা
(অশোক মিত্র-র জন্য)

১. ভেলা

পৃথিবী জ্বলে যায়, এখনো জলে ভেলা
ভাসেনি, তোলা আছে। কোথায় আছো তুমি?
পাহাড়যুগলেরা আজ কি সমভূমি?
শূন্য মন্দির শুধেছে অবহেলা?

হয়তো অজগর গেলেনি হরিণীকে।
উপত্যকা থেকে কোথাও বারবার
এখনো প্রতিবাদী বাঘেরা হুঙ্কার
শোনায়, দাবানল যদিও দিকে-দিকে।

কখন সে-পাবক ঢুকেছে সব ঘরে,
চিনেছে নগরের জটিল পথঘাট,
হয়েছে শবাসীন, শ্মশানে সম্রাট!
কোথাও কিছু তার থাকেনি অগোচরে।

আমারও গেছে সব, নিয়েছে দাবানল।
যে-ভেলা ভাসলো না, এখন তাতে আর
কী হবে ফিরে পেয়ে অলীক অধিকার?

কেবলই দূরে যায় নদীর কোলাহল ॥

২. আলোয় অন্ধকারে

বিগত লগ্ন, মালিন্য জ্যোৎস্নায়।
মনে হয় যেন একদা-সাধ্য সেতু—
মাতঙ্গ ঢেউ ধুয়ে নিয়ে চ'লে যায়,
ধ্রুবতারকায় জয় করে ধূমকেতু।

গ্রীষ্মের শেষে খরতর গ্রীষ্মের
লাভা নেমে আসে উপত্যকার ঘাসে,
উড়ে যেতে-যেতে পথিক-পাখির ঝাঁক
অসহায় ডানা ঝাপটিয়ে নেমে আসে।

সুপ্ত প্রাচীন পল্লী। স্বামীর শব
ছুঁয়ে ব'সে থাকে করুণ বালিকা যবে,
নগরে মাতাল মূষিকের উদ্ভব,
তৃপ্ত শকুনি ঝল্সানো পল্লবে।

নিখিলে প্রলয় সমুপস্থিত যেন :
বৃথা প্রত্যাশা, থামে না দুর্বিপাক।
অথচ এখনো ভুলতে পারি না কেন,
কেন মনে হয় শুনেছি ভোরের ডাক ?

আলো চোখে আজো ম্লান এশিয়ার কোণে
জরায়ুতে নারী শিশুর বার্তা শোনে!
শিশুকে কোথায় কে শোয়াবে, বলো, কার
অক্ষত হাত পরাবে সোনার হার ?
বুকে নিয়ে তারে কে আজকে দোলা দেবে ?

আকাশে বিশাল বিদ্যুৎ চমকায়,
বৃষ্টি এখনো নামেনি মুষলধারে।
ধুলোকালিকাদা দিল্লী কলকাতায়,
আমরা আহত বারুদে অন্ধকারে।

সে-নারী কোথায়, জন্মে-জীবনে জয় ?
যার বাঁকা ভুরু, যার কালো চোখ, যার
চিকণ গলায় অলখ সোনার হার ?
অমোঘ কণ্ঠে প্রভাতের নির্ভয় ?

কাক

কলকাতা কৈলাস তার গ্রীষ্মের বিবস্ত্র দুপুরে।
বর্ষায় বিরক্তি নেই, কীটে কাটা গরম র‍্যাপার
ভাঁজ ভেঙে শুকোয় না শীতে কাবু বুড়ো রোদ্দুরে,
ক্ষয় করে উপেক্ষায় কুটিলের রসনার ধার।

আনন্দে ক্ষুধায় ক্ষোভে হাহাকার করে দিগ্বিদিকে,
তাড়ায় সূর্যের ঘুম জঠরের অজেয় জ্বালায়।
শোথ-শ্বেত শ্লথ হাতে আশাবরী উষা দেয় লিখে
আকাশে প্রভাত : তাই পৃথিবীর পঙ্কিল থালায়

অতীত রাত্রির বাসি উচ্ছিষ্টের সুস্বাদু প্রসাদ
জায়াহীন তারে সাধে শুদ্ধাচারী কপট বিমাতা,
সুন্দরী সৌখিন দিন,—যত তার বৃথা আর্তনাদ
ত্রিলোকে সান্ত্বনা খোঁজে!
বিকেলে মর্মর করে পাতা,
আলো নেভে, হানা দেয় তান্ত্রিক নিশির তিন ডাক।
সারারাত্রি শিরে তার পাতা ঝরে, সে ঘুমোয় : কাক॥

একটা নষ্ট ফল

আহা রে, তুই কে-ফল অকালে
কৃপণ ডালে ফলতে গিয়েছিলি!
কেউ এখানে ফলতে আসে না রে—
খোঁজে না কেউ বেদনা নিরিবিলি।

ভিখিরিদের ভীত পায়ের ফাঁকে,
ব্যভিচারীর পাপমেশানো পাঁকে,
ফুলের বেলা অবহেলায় ঢাকে,
ছি ছি ছাপায় প্রাণের ঝিলিমিলি।

তাপ জুড়োনো ঘাটের বারাণসী :
তুই এখানে? কী দেখতে যে আসা!
কাঁকালে-সোনা নারীতে উর্বসী?
বিশ্ব ভুলে বিধাতা ভালোবাসা?

দেহের কোষে যা এনেছিলি তার
তীর্থে ভীড়ে দলিত সমাচার
পেঁছবে না ত্রিদিবে, সংসার
বুঝবে না সে-অভিধানের ভাষা॥

স্বগত

চাই না, চাই না, চাই না তোদের, ফিরে যা তোরা,
শ্রাবণ-শোভন গগনে পবনে অলস বিলাসে পালক ওড়া,
অমল নীলায় মোহিনী লীলায় পাল তুলে ভাস।
আকাশ আমার কেউ নয়, সে তো দূরের আকাশ—
আরেক দেশের, আরেক গাঁয়ের, আরেক পাড়ার :
কত তার সখা চন্দ্রতারকা, নিদ্রাহারার
বন্ধুতা মেনে অপমান হবে?
থাক-থাক, ঢের
হাসি-হাসি মুখ, আহ্লাদি ঢং দেখেছি তোদের
ফুটফুটে ফুল।
এই যে, বকুল, কখন এলে?
কে না একদিন ছিল তোমাদেরই প্রাণের দোসর? দু'দিনে সে-ছেলে
পর হ'য়ে গেল! সাধু সাধু! তবু কী যে ভালো নাম
মা-বাবা তোদের দিয়েছে, তাঁদের শতেক প্রণাম।

চাই না বৃষ্টি, চাই না দুপুরে ছলোছলো মেঘ।
নেবো না কুড়িয়ে সন্ধ্যার রেণু। যত ঝগড়াটি ঝড়ের আবেগ
ত্রিসীমায় আর দেবো না ঘেঁষতে। শিমুলে শালিখ
দিক ধিক্কার, যত প্রাণ ভ'রে ধিক্কার দিক।

কত ভালো আমি বেসেছি তোদেরও, নিজের হাতের বাচাল আঙুল!
ফুলের শরীর ছেনেছিস তোরা, ছুঁয়েছিস তার জানুঢাকা চুল।
তার নীলখাম তোরা ছিঁড়েছিস, দিয়েছি ছিঁড়তে আমার আগেই :
বিশ্বাস নেই, নিজের শরিক শরীর তাকেও বিশ্বাস নেই।
বিশ্বাস নেই বিলাসী চোখেরে, হায়রে অন্ধ। সুরভিমত্ত
বিষয়ী নাসিকা, এই ঝরা-বনে শোনাবো না কোনো পরমতত্ত্ব।
থাকো মূর্ছিত, থাকো ভাবে ভোর, স্বাধীন, স্ববশ, নির্বিশঙ্ক।
তোদের ছোঁবে না আত্মগ্লানির দীন হাতে ছানা পাপের পঙ্ক।
যখন চেয়েছ, যা চেয়েছ ঠোঁট, স্বার্থসাধক কান, ভীরু ত্বক,
সাধ মিটিয়েছি, ভাবিনি তোরা যে এত প্রতারক।

তোরা সৌখিন, তোদের কী দায়, তোরা তো বেকার।
সংসারে তোরা দিলিনে কিছুই, ইচ্ছে হলো না কিছুই শেখার।
আঁকিসনি ছবি, গড়িসনি গান, মৃত বিবর্ণ কঠিন পাথর
আঙুল বুলিয়ে হলো না কিছুই, কথা ছিল রূপ হবে!
আজ ফিরে যায় দেবতার যত বর।

খার্সং-এ একটি মৃত্যু

খার্সং-এ সন্ধ্যা করলো, স্যানাটোরিয়ামে
তাকে শেষ দেখে এসে ফিরতি পথে ভাবি—
(পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে হেনার সুরীভধারা নামে)—
কেন ছেড়ে যেতে হয় অসময়ে ধরণীর দাবি?
মন্ত্রী কি মেয়র হবে ভাবেনি সে। তবে?
মদ্যপ মোটরে চেপে চাপা দেয়নি ভিখিরী ছেলেকে।
ছলোছলো দুটি চোখ বুকে মেনে তবু যেতে হবে
অস্তদূরে? শেষ দৃশ্যে অকম্পিত হাতে দেবে এঁকে
গিরিশিরে রৌদ্রআভা জাফরানী কুঙ্কুম?

ভাবতে-ভাবতে দার্জিলিং। মন ক্লান্ত, চোখভরা ঘুম।
কাল আবার যাওয়া আছে গ্যাংটক, অনেকটা পথ।
অন্ধকারে অজগর ঝরনা ফোঁসে, চেয়ে দ্যাখো ছায়া
দৈত্যদানবের, যারা দিবালোকে পাহাড়পর্বত।

দুই দৃশ্য

সতীশের হৃদয়ের বন্ধু তারই নিজের হৃদয়!
চৌরঙ্গী সংসারে তারা দুই বন্ধু প্রাণখুলে হাসে।
অবিনাশ নলিনাক্ষ হৈমবতী কমলা অক্ষয়
জোড়ে-জোড়ে ছায়া খুঁজে পরস্পরের আশেপাশে
পিঁপড়ে হ'য়ে ভিড়ে যায়।
'কী করুণ দৃশ্য, ওহো, জানো না তো ওরা,'—
সতীশ বন্ধুকে বলে, 'সব সখা-সখী কত অসম্ভব একা।
ঘন-ঘন কাশি পায়, আস্তাবলে ছানিচোখ হৃতপক্ষ পক্ষীরাজ ঘোড়া!
নিতান্ত মিলতেই হবে যদিও দু'দন্ড তরে দেখা?'—
এই ব'লে সে তখন হৃদয়ের বন্ধুটির হাত
আরো শক্ত চেপে ধরে, নিরিবিলি উষ্ণতার কোণে
দ্রুত টেনে নিয়ে যায়, কানে জপে : 'শুনো না স্যাঙাৎ,
পরের মন্ত্রণা তুমি।'
মাকড়সা রাত্রির জাল বোনে।
অবিনাশ-নলিনাক্ষ হৈমবতী-কমলার চোখের চৌকাঠ
ছুঁয়েছিল পার হ'য়ে প্রেমের অক্ষয় বালিয়াড়ি।
ভেবেছিল পাওয়া গেছে চিরন্তন গৃহস্থের বাড়ি :
অন্ধকারে হাতে ঠেকে বন্ধ ভারি নিরেট কপাট!

ভিন্ন ঘরে রাত বাড়ে, ঠান্ডা হয় সতীশেরও পাশে শূন্যখাট॥

একটা স্বদেশী নাটক

১

'মহান তাসের ঘর, এরই মধ্যে যজ্ঞ জ্বালা চাই :
পবিত্র বিকেল ছ'টা, সংকল্প নিলেম, তোমরা মনে রেখো ভাই।
তাসে গড়া, তবু এরই অলীক দেয়ালে
স্বপ্ন চরিতার্থ হবে অনাগত পোটোর খেয়ালে।
অচিরাৎ জরাজীর্ণ তম্বুরার তার
সুরের সম্যক নাদে ভ'রে দেবে বেবাক সংসার,
এ-বিশ্বাস চিত্তে নিয়ে এসো আজ ভংগ করি সভা।'—
বাহবা, বাহবা।

২

সভা শেষ। দেখি যদি সিগারেট কাছে আছে কারো।
আনিনি ট্র্যামের পাশ, ওহে কেউ দু'চার আনা ধার দিতে পারো?
আবার চা কেন, ভাই! এ-বৃহৎ কাজে
এইসব তুচ্ছ দিকে এখন কি মন দেওয়া সাজে?

৩

অপূর্ব কুশলী শিল্পী এলো এক, শূন্যে তোলে ছাদ;
আকাশ গম্বুজ ছোঁয় দেখতে-দেখতে তাসের প্রাসাদ।
এখনো দেয়াল বাকি, সবশেষে গড়া হবে ভিত।
রক্ষা পাবে সনাতন রীত।
'এঁরই মাঝে একদিন যজ্ঞ জ্বালা চাই—
মনে রেখো, মনে রেখো ভাই।'

৪

গিলে লজ্জা ভয়
কে বাচাল একদিন জানতে চায়, কখন সময়!
গোলামের ঠোঁটে জ্বলে ধিকিধিকি শস্তা সিগারেট,
বিবিদের আশেপাশে বাবুদের রপ্ত এটিকেট
সন্ধ্যার সুরভি খোঁজে। কোথায় যে তাসে গড়া ঘর!
অন্ধকারে শোনা যায় অনর্গল বক্তার স্বর :

'ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, তাসপ্রাসাদ হলো না, তাতে কী?
তাই ব'লে দৈববাণী কখনো পারে না হ'তে মেকি।
আছে ঘাস লতা পাতা, দেশলাই দিয়ে যজ্ঞ জ্বালো।'

বিবিরা অগত্যা লাল, গোলামেরা কোথায় পালালো।

ইত্যাদি ইত্যাদি শুধু গোধূলির বিখ্যাত ভজন,
বর্ষার বিলাপ, কিংবা সাতবাসি ফুলের পাঁচালি,
কিংবা দ্রুত স্বরবৃত্তে হা-রে-রে-রে, দে রণ, দে রণ :
ওড়েসাড়ে এ তো সেই মান্ধাতার আপালি-চাপালি!
এই শুধু? শুধু এই? এ-বস্তু কি কবিতার নামে
পেরেছে পাঠাতে কেউ সার্থকের তীর্থগামী খামে?
সে-চিঠি হয়নি বেয়ারিং?
উত্তর জানে না কোনো এভারেস্টজিৎ তেনজিং।

ভয়

সবাই পারে না, হয়তো একজন মাতাল বিস্ময়
'বিশ্বে মৃত্যু নেই আর'—এই ব'লে প্রলয় পেরিয়ে
মানহাটানে হাসপাতালে মৃত্যুকেই করেছিল বিয়ে :
তাঁরই থাকা হোটেলেই থেকেছি, কাটেনি মনে ভয়।

বিখ্যাত বীরভূমে স্নিগ্ধ শালবীথি, লাল পথে গান
জ'পেছে অমর্ত্য আশা : এ-আঁধার ক্ষয় হ'য়ে যাবে।
কী ক'রে ডোবাই প্রাণ মৃত্যুময়তার অপলাপে?
অথচ কী ক'রে বলি—তুঁহু মম শ্যাম সমান?

কেননা গলিতে ছায়া, অতর্কিতে আগন্তুক হাত
কাঁধ ছোঁয়, মাটি ফুঁড়ে চেঁচায় অচেনা কারা শব!
থমকে যায় অপ্রতিভ জারুলে বেগনি কলরব,
বিকেলের রাজ্যপাট লুটে নেয় নিষ্প্রদীপ রাত।

তবু নাকি মধুময় এ-বিশ্বের ডোবাভরা লাশ!
শিশুর ঝলসানো চোখ তবু নাকি ক্ষমা ক'রে যাবে!
পবিত্র পদ্মের দল জিতে নেবে নররক্তস্রাবে,
প্রাণের নীলিমা নাকি ধুয়ে রাখবে সঞ্চয়ী আকাশ!

কী জানি, হয়তো তাই। ক্ষমা, জয়, সঞ্চয় অপার
আছে জেনে ঋষিকেশ অবিচল প্রলয়ের গ্রাসে!
মাতাল বিস্ময় তাই মানহাটানে হাসপাতালে হাসে,
মৃত্যুকে অঙ্গুরি দিয়ে গায় : 'বিশ্বে মৃত্যু নেই আর'।

পিতার তালুক গেছে, তোমার রাজত্বে আমি জানি
উদরান্নে টিঁকে আছি, ছোট মুখে সাজে না বড়াই।
তুমি ব্যাপ্ত চরাচরে, তাই আমি তোমারে ডরাই।
তোমার রাজস্ব জেনো যথাকালে পাবে, মহারানি।

আত্মগ্লানি

দাঁড়াও পথিকবর, শোনো বন্দী নাবিকের গান :
ডাঙায় ভাসে না তরী, কী তপ্ত বালির চড়া
শহরে সাংঘাতিক বর্তমান—
কার সংশয়,
বললেও তা হবে না প্রত্যয়।
গলিতে পাঁচসিঁড়ি উঠে দোতলার ঘরময়
ইতস্তত থেকে যায় কাল্পনিক মাথার চুল ছেঁড়ার প্রমাণ।
অমৃতস্য অধম পুত্র, সাতসমুদ্রে বিশ্রুত নাবিক
যে-ছিলো একদা, আজ তার দুঃখ করো অবধান।

কাঁটায়-কাঁটায়, এ কী, রাত দুপুর?—থাকগে, থাকগে,
যুদ্ধের হুল্লোড়ে কেনা সাতসিকের জাপানি ঘড়ি,
মরি মরি, সে-ও চোখ রাঙায়!
করো কী করবে, যা আছে হবে ভাগ্যে।
মশায়, কার তোয়াক্কা করি?—
(যদ্দিন না শেষ বিদায় নিচ্ছি ভবলীলা সম্বরি।)
মাথাটা দপদপ করছে, শিরঃপীড়া বুঝি!
হেনকালে ভেবে দেখ, মন,
কী গভীর নিদ্রামগ্ন ঘরে-ঘরে সুখী বালকেরা
নিদ্রামগ্ন শান্তিনিকেতন।

পথিকবরদের প্রতি করি তবে শেষ কনফেশান :
যৌবন করেছে বধ যেই সব মহাপাপী খুনী
বিশুষ্ক তাদের ভাগ্যে কল্যাণী নিদ্রার সুরধুনী।
বাকিটুকু বুঝে নিও—কেন যে দেয়ালে দিন গুনি।
কবে আসবে, আসবে তো? কারামুক্ত ১৪ই এপ্রিল?
তদ্দিন সকাল সন্ধ্যা, সাড়ে তিনটে চায়ের বিকেল,
উড্ডীন আকাশমুখী চিল
ব্যর্থ হোক, আঁটা থাক দরজায় খিল।
বসন্তের বিখ্যাত নিখিল
ভগ্নমনে ফিরে যায় যাকগে, পাবো পুনর্দর্শন :
সাহিত্যমেলার ভিড়ে
সে-নির্লজ্জ ফিরে-ফিরে
যাবে না কি শান্তিনিকেতন?

দুঃখের দিনের কবিতা

বৃষ্টি থামে প্রলয় শেষে, আকাশ মোছে আঁখি;
ছাতায় ঢাকা বাঁকা গলি পরে আলোর রাখী?
স্বপ্ন থেকে জেগেই দেখি করাল অন্ধকার
ভুবন ডোবায়, স্বর্গমর্ত্যপাতাল একাকার।
আতঙ্কে হিম তীক্ষ্ণ চোখে তাকাই চতুর্দিকে—
যোজনজোড়া অগাধ ঘুমে আকাশ-তারা ফিকে।
চাঁদের নৌকো তলিয়ে গেছে, লোনা ঢেউয়ের জলে
ঘাটে-ঘাটে অশরীরী ছায়াভাসান চলে।

ভোর কি এদেশ ভুলে গেছে? কোথায় ঢালু উপত্যকার ঘাসে
সূর্য আলোর ধেনু চরায়, বাজায় বাঁশের বাঁশী?
কোথায় সে-পথ রাঙাধুলোর? বাঁয়ে কিংবা ডাইনে?
চাইনে—চাইনে, অনিশ্চয়ের দোলায় দুলতে চাইনে।
কঠিন পথের কাঁটায় যদি পা কেটে যায় যাক না,
চাইনে আমি মনভোলানো আকাশচারী পাখনা।
শুনেছিলাম তীক্ষ্ণ নখে অন্ধকার ছিঁড়ে
টুকরো ক'রে ফেলতে পারে মায়াহ্রদের তীরে
অবতীর্ণ ভোরের আলো : কোথায় তুমি, পাখি?
কোথায় তুমি, ঊর্ধ্বমুখে দু'হাত তুলে ডাকি।
চাইনে আমি তিমিরতলে ছায়াপথের স্বস্তি।
বলো, কোথায় উদ্ভাসিত প্রশস্ত পথ অস্তি?

উদয়সাগর, উদয়শিলা, দেখতে কি পাও দীপ্ত রথের চাকা
দিগন্তরে সোনার রঙে আঁকা?

প্রশ্ন : ১

ফিরে দাও, ব'লে পা ছড়াস যদি
উজানে যাবে না জীবনের নদী।
তাই ভেবে বল, সত্যি কী চাস?
উড়ে যাওয়া দিন, পুড়ে যাওয়া ঘাস,
যদি ঘিরে আসে তোর চারপাশে
খুশি হবি? যদি আসে সেই সবই?
বৈশাখে জাগা ধু ধু নদীচর,
ছায়ায় ছোপানো মাটিলেপা ঘর
ক'টি মানুষের, আপন দেশের?
জানলা তাকানো চোখে চাপা জল
বৃষ্টি বিকেলে হোক বিহ্বল
আরো একবার, তুই তাই চাস?
পাহাড় পেরিয়ে যত শাদা হাঁস
উড়ে গিয়েছিল কোনো এক শীতে
কোনো এক মাঘে কতকাল আগে,
আবার তাদের ডাকবি কি ফিরে
বনতালশির দীঘিটির তীরে?
সত্যি কি চাস আবার আসুক—সেই কী যে নাম,
ছিপছিপে মেয়ে, চোখে-চোখে হাসি, প্রাণের আরাম?
এতকাল পরে চিনতে পারবি সে এসে দাঁড়ালে
যে গ্যাছে হারিয়ে অন্ধকারের চিকের আড়ালে?

প্রশ্ন : ২

মনের ধেয়ানে নেই নেই চাঁদ তারা নেই
নেই আর জানালায় আলো আসা।
সকলি কি ফিরে দিতো ধরণীর এক কোণে
কন্যার এককণা ভালোবাসা?

পরিণাম

মায়া হরিণ, সোনা হরিণ, তুলিতে আঁকা আঁখি,
তাকে যে আমি খুঁজেছি কতবার।
নীরব বন, নিবিড় বন, গহন বনে তাকে
কখনো যেন শুনেছি আমি, কখনো যেন দেখেছি ছায়া তার।

তাকেই ভেবে আকাশ-ঝরা রুপালী ঝর্ণার
শুনিনি আমি হাসি,
দেখিনি কবে অস্তাচলে আকাশ দিলো ছেয়ে
নিষাদনীল মেঘেরা রাশি-রাশি।

শিথিল দেহ, অবশ প্রাণ, রক্ত ঝরে পায়ে,
কপালে ঝরে ঘাম।
রাত্রি আসে, সূর্য নেই, সময় নেই আর—
যখন ছিলো ভাবিনি পরিণাম।

এখন সব পাখিরা চুপ, আকাশে কাঁপে তারা,
অন্ধকার খালি
এ-বন থেকে সে-বনে যায় শব্দহীন হাতে
বাজিয়ে করতালি।

এলো না তবে, দিলো না ধরা, মিলালো মায়ামৃগ :
হায় অতনু, ব্যর্থ তব তূণ।
অতর্কিতে অট্টহাসি সহসা খুন করে
রোমাঞ্চিত প্রাণের ফাল্গুন।

আকাশময় সে-পরিহাসে তারারা যোগ দেয়,
হাওয়ায় জাগে হা—হা—,
রাতের পাখি সুযোগ বুঝে উচ্চে তুলে স্বর
ছড়ায় 'আহা—' 'আহা—'।

আলোছায়ায় কত হরিণ নিলো বাঘের থাবা,
কত হরিণ ঘাসের বনে এলো,

কত হরিণ শিং ঘ'সেছে বনের গাছে-গাছে,
আমার মনে বিষাদ এলোমেলো।

অভয় বন, বিদায় তবে, নিঃশেষিত তৃণ,
সাঙ্গ পরিক্রমা।
বিদায় তুমি কে মায়াবিনী, হে রঙ্গিনী নারী,
বিদায় প্রিয়তমা॥

বার্তা

শরৎকালের নিশান্তে এক
সত্যিকারের চাঁদ উঠেছে—
দেখতে পেলেম,
সত্যিকারের চাঁদ উঠেছে—
তাই তোমাকে বলতে এলেম :
হায়রে হায়,
তুমি তখন গভীর নিদ্রাগতা !

খুশির সকাল চায়ের বেলায়
সোনার রোদটি উপচে পড়ে,
মিশে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি
প্রাকৃতিক এই নেশার জ্বরে,
বলতে এলেম :
তুমি তখন দিনের কর্মানতা !

পুরনো প্রথা

গাঢ় একটি মেয়েকে সে ভালোবাসতো,
একদিন আর বাসলো না :
তার যৌবন গেল দূরে।

ঢালা একমাঠ ঘাসকে সে ভালোবাসতো,
একদিন আর বাসলো না :
রোদে সবুজ গেল পুড়ে।

আপাতত তমস্বিনী

রাতের সাগর, তারো কালো জল আলোড়িত হয়
নক্ষত্রের দীর্ঘ স্নানে দৃষ্টিসীমাময়।
ভোরে রোদ উঠে এসে মায়া হাতে মুছে নেবে সব,
ফুরোবে সকল কালো, আকাশে বিদীর্ণ কলরব।
তাহ'লে বুকের শাদা হাড়ে
অনিকেত রাত্রি কেন বাড়ে?

এখনো পারিনি ভুলতে, গোপনে এখনো মনে থাকে—
চিরস্থায়ী ব'লে ভাবি যাকে
হয়তো বা ধ্রুব নয় অনাকার সেই অন্ধকার;
প্রমাণ থাকবে প'ড়ে অবশিষ্ট একমুঠো হাড়
অপার্থিব কোন এক রৌদ্রময় শুভ্রতার সুখে
চিরতরে খুলে যাওয়া অতিকায় দ্বারের সম্মুখে।

আপাতত পাঁজরের তলে
তমস্বিনী তবে কেন অবিরত ভিন্ন কথা বলে!

অজ্ঞাতবাসের ভূমিকা

হায়, ঝড় নেই। বিশ্ব ছেয়েছে কেবলই ঝরা পাতা,
দিনরাত ঝরে, ঝ'রে যায়।
বিশীর্ণ বিপুল বন, শাখাশীর্ষে পাতুক পল্লব
আঁধারে আলোতে বাগিচায়।

বনে এত প্রেত কেন, শাদা এত কঙ্কালের দাঁতে?
চোখের বিবরে এত সাপ?
কনকপরীরা কেন এ-কাননে ডাইনী হ'য়ে যায়?
জ্যোছনা ঝরে শুধু মনস্তাপ?

সব বাঘ ম'রে গেছে, ফিরে গেছে সব দেবতারা,
গেছে সব হলুদ, কপিশ।
খোসার আড়ালে ফল কখন প'চেছে ডালে-ডালে,
সব জাম কামরাঙা বিষ।

ঝড়েরা উধাও, শূন্যে কোনো মেঘ ফ্যালে না নোঙর।
অবজ্ঞাত বিধানকর্তার
হাহাকার থেমে গেছে, স্তূপাকার ঝরাপাতা ঢাকে
তার কৃশ পাঁজরের হাড়।

সাঙ্গ বনবাস। বাকি অজ্ঞাতবাসের বারো মাস :
নৃত্যগীত বিরাট-সভায়!
কোথায় লুকোবে তূণ? হায়, সব শমীশাখা থেকে
অন্তহীন পাতা ঝ'রে যায়॥

পুনর্বিবেচনা

শরৎকালের চেনাদিন আর খুশিভরা ঝরঝরে কিরণে
মিলে মিশে গেল এক হারাকাল আর এই
উজ্জ্বল প্রাকৃতিক হিরণে।
নবীন পল্লব,
কালো আর নীলকণ্ঠী ছোপ দেওয়া দোয়েলের আপন গলার সুর
স্নেহের সজীব মাধুর্যে
শুকনো মনকে তাজা আশ্বাসে করছে ভরপুর।
নানাখানা হাহাকার, বাঁকানো মনের চাপা কান্না
দিকে-দিকে দাবি তোলে : 'এ-অকালে সুর না, স্বর না, গান না।'

অথচ ঘুমের আগে ভয়কে কাল যখন দেখি
জৌলুষ মাখানো লক্ষ তারার দিকে চেয়ে
তখনো ভুলতে পারিনি যে অবিশ্বাস্য আধখণ্ড চাঁদ
মরা দেশকে অল্পবিস্তর ছিল ছেয়ে।
তারপর এই সকালবেলা যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে রামধনুর মতো,
অর্বাচীন কাশফুলেরা প্রণামের ছাঁদে মাথা করছে নত,
কার যেন পুজো হচ্ছে কোথায়
দুঃখী ও দুর্লভ এই শরৎকালের ভোরে।
কুণ্ঠিত উপোসী মন নিয়ে ছোটলোকের মতো, বলো,
কে থাকতে চায় প'ড়ে?

প্রাণের মিত্র

যাদের জেনেছি সকলের চেয়ে আপনার
তারা চির কেউ নয়।
বসন্তভোরে এ-দিগ্বলয়,
মাঠে রোদ্দুরে শুয়ে-থাকা ঘাস,
অভয় আলোর অকূল আকাশ,
প্রাণের কুলায়ে পাখিদের গান,
অবুঝ পাঁজরে বেঁধা অভিমান,
নিরিবিলি শাদা ঐ বাড়িটার
খোলা জানালায় সকালের রোদে
সবুজ আভার রচিত চিত্র—
মায়াময়, তবু প্রাণের মিত্র।

স্মৃতির সুতোয় যত গাঁথি হার
জানি একদিন হারাবে সবই,
সব ছবি, সব ভালো ছবি, সব কালো ছবি
শুধু চ'লে যাওয়া, আর কিছু নয়:
তাকিয়ে দেখার বেশি অধিকার
দেবে না সময়।
দেখতে-দেখতে পাতা ঝ'রে যায় ফাঁকা দুপুরের।
চোখে জল আসে গাঢ় বেদনায় অজাত সুরের।
ভেসে ওঠে মনে কোনো অজস্র কালো কুন্তল,
দেবতার বরে কার বক্ষের দুটি কাঁচাফল
ভালোবেসেছিলে, সে কি অক্ষয়?
কী হয় না জেনে, শুধিয়ে কী হয়।
তারকার সভা জ্যোতিহারা হ'লে
কোথায় মিলায়? ছায়ায় ছায়া।
সে-ক্ষতি যেদিন আসবে আসুক,
আজ বৈশাখে বুক ভরে সুখে
অলস মায়া।

নবীন কবিকে

বয়স যখন পঁচিশ পেরোয়, সবাই যখন মানে,
বয়স্কেরা ঈর্ষা করেন, কারণ এ-অঘ্রাণে
তাদের ডালে খ'সবে পাতা তোমার ডালে জাগবে যখন কলি;
ছাপতে যাবে কত কবির পোকায়-কাটা ম্লান রচনাবলী;
ছাড়বে বহু শীর্ণ শাখা হরিৎ পাখির ঝাঁক :
তোমার বনে অকারণে শত পাখার ঝাপট
হাজার হরিয়ালের ডাক!
(হয়তো কিছু ছায়ার আনাগোনা?)
স্বর্গে-মর্ত্যে কুচক্রীরা তখন ব'সে যতই বুনুক জাল,
প্রাণকে জপাও—কিছুতে দমবো না।
পকেট ভরা জোনাক নিয়ে, অনেক ছুটে ঘেমে,
আর একটা শীত আসার আগেই স্বর্গ থেকে নেমে
আসতে হ'লে এসো, কিন্তু ততক্ষণ তো থাক
সাঁঝসকালের অন্ধকারে ম্লান দ্বিতীয়ার দেবী এবং
গাল রঙানো কথা বলার ফাঁক।
নেভে যখন নিভবে আগুন, পঁচিশ ডুববে ত্রিশে।
আপাতত ফিঙের ঝুঁটি বুনো ঘাসের শিষে॥

নগরে নবীন মেঘের চূড়ায়

নগরে নবীন মেঘের চূড়ায় অপরাহ্ণের আলো :
গতকৈশোর চঞ্চলতায় সহসা উতলা অন্তর চমকালো।
হায়রে ভুবনমনভুলানিয়া
ক্ষণিক দিনের অঙ্গীকার
এই অবেলায় যারা মনে আসে
তারা কে কোথায় সঙ্গী কার!
কোনো স্বাক্ষর থাকে না কোথাও,
দেনা হ'য়ে যায় শোধ।
আকাশের গায় সকালে বিকেলে
মুছে যায় নানা রোদ।
তবু প্রসাধনে রঞ্জিত মেঘে
কিছু লেখা থাকে সান্ত্বনা :
আহা তারা থাক, কোনোকালে যারা
জীবনের জ্বরে ক্লান্ত না।

ফাল্গুন ১৩৫৯

১
বেশ জায়গা পৃথিবীটা। ফেব্রুয়ারি। বৃষ্টি বা কুয়াশা
পলাতক কিছুকাল। শুধু যদি দুঃখী কোরিয়ায়
রাক্ষুসে নিধনপর্ব শেষ হতো, চীন দরিয়ায়
থামতো মানোয়ারি প্যাঁচ, তাহ'লে, ফাল্গুনে করি আশা,
কলেজী বক্তিমে ভুলে ভনিতাম—'খাসা বেঁচে আছি।'
অকারণে দুই বেলা সূর্য ওঠে, সূর্য অস্তে যায় :
পারি না, পারি না হ'তে যৌবননিকুঞ্জে মৌমাছি।
আপাতত এক ফাঁকে শান্তিনিকেতন,
যাওয়া যাক সাহিত্যমেলায়।

২
কেমন, বলিনি? দ্যাখো, বসন্ত ফোটায় গাছে ফুল।
(ধন্যবাদ গৌরী দত্ত, শ্রী নিমাই চট্টোপাধ্যায়।)
তিপ্পান্ন সালেও আজো ফাল্গুন কী-রঙ্গ দেখায়
বিশ্বাস হতো না যদি না-দেখতুম জ্বলন্ত শিমূল
বীরভূমে অজয়তীরে (সাক্ষী থাকে অম্লানকুসুম ;—
সাক্ষী থাকে অধ্যাপক সুমসৃণ মাথাজোড়া টাক,
সারা রাস্তা ভদ্রলোক, বাপরে বাপ, কী বকবকুম!
কিন্তু এবে পরচর্চা থাক।)

৩
তাহ'লে ফাল্গুনে দেখছি—আরে, তাই তো, সত্যি যে পলাশ!
এতো লাল?
ঐ কি রঙ্গন?
পৌঁছলাম শান্তিনিকেতন।

৪
হাসিমুখ, চেনা চোখ, সাহিত্যমেলায় তিন দিন
গানগল্পহৈচৈ, ঘণ্টা গেলো কাজে বিনা কাজে।
সন্ধ্যায়, গভীর রাতে ধ্যানলগ্নে ক্ষীণ সুরে বাজে
অখিল আকাশে কোন বীণ।

কী ভাগ্যে আবার দেখা হলো এ-জন্মেই!
যুগলে নিঃশব্দ হাঁটা খোয়াই ছাড়িয়ে, তবু মুখে কথা নেই।
কিংবা শত লক্ষ কথা আছড়ায় দুয়েরই মৌন মনে।
সেই তো মঞ্জরী দোলে এতকাল পরে, হায়,
বিখ্যাত উদাস শালবনে!
রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা বাংলার দুই তীরবাসী
অগ্রজ অনুজ কতো লেখককে এনেছে পাশাপাশি।
—হ্যাঁ, আরো দু'দিন আছি। সভায় যাবে না? প্রায় ছ'টা!—
আকাশে মিলিয়ে এলো সূর্যাস্তের বরণীয় ছটা।

৬

রাত দেড়টা। কফি-পর্ব শেষ হলো প্রাক্তনীর ছাতে।
একাকী বিষণ্ন জ্যোৎস্না দাঁড়িয়েছে দূরে লালবাঁধে।
'বসন্ত সত্যিই আসবে? কী দরকার এসে?'—
সুভাষ পড়লেন মৃদু হেসে।
হ্যারিকেনে মৃদু আলো, বড়ো হাওয়া, খোলা ছাত।
কিন্তু কী মশার উৎপাত।

৭

পবিত্র সকাল, কতোকাল দেখিনি যে!
অবাধ্য দু'চোখ যায় থেকে-থেকে অকারণে ভিজে।
ঘুম ভেঙেছে সেই কখন, যাই দেখি চশমাটা পরি :
ঐ ঐ-তো ছিলো মশারির দড়ি!
না-পেয়ে কাল সারারাত কী কষ্ট।
সকাল সাতটায় দেয়ালে ঝুলছে পষ্ট।

৮

'মন তুই পড়্‌গা ইশ্‌কুলে—
নয়তো কষ্ট পাবি শ্যাষকালে—'

নেচে-নেচে বাউল গাইছে, একতারা ঘুঙুর হাসিচোখ।
রোদ উঠেছে, চায়ের বেলা—
ভুলতে চাই হঠাৎ ইহজন্মের শোক।

এমনকি ভুলতে চাই আজ তাকেও।—
তবু, তবু কে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকো?

৯

তারপর শেষ সন্ধ্যা
শেষ গান
আলো নিভলো
উঠি :
ফুরিয়ে গ্যালো ছুটি।

বৃক্ষ

দিন চ'লে যায়, তুমি তাকাও না, ঋতুর নিয়ম
ঝরিয়েছে শিরে তার ঠাণ্ডা বৃষ্টি, হাওয়ার চামর
বীজন ক'রেছে তাকে, কেড়েছে হলদে পাতা যম।
একা সে নিশীথ রাত্রে শুনেছে মেঘের রুদ্ধ স্বর।

তোমারই সে প্রতিবেশী, চেনে তাকে অতিথি পাখিরা।
কী সুস্থ নিয়মে বাঁচে, জীবন যদিও মৃত্যুমুখী।
অশোক আনন্দ তাকে মাতৃস্নেহে মুছে দেয় পীড়া,
পিতা সূর্য শুশ্রূষায় করে তাকে নিরাময় সুখী।

জীবনে সংগ্রাম তারও, লক্ষ বাহু মাটির গুহায়
রস অন্বেষণে রত, গ্রীষ্মের দাহনে ম্রিয়মাণ
সে-ও প্রতিবর্ষে। তবু জরাজয়ী মালিনীর প্রায়
যথাকালে মালা গাঁথে।
তুমি তার শোনো না আহ্বান!

নাস্তিকের গান

শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়
তাকে ডরাই ;
ভালুকের মতো আগলিয়ে থাকে দরজায়
তাকে ডরাই ;
ঈগলের মতো বাঁকা নখে পড়ে ঝাঁপিয়ে,
ডুকরিয়ে ওঠে গৃহস্থপাড়া কাঁপিয়ে,
বুড়ি ছুঁতে গিয়ে অবেলায় পড়ে হাঁপিয়ে,
তাকে ডরাই।

আমার শান্তি সাধু ভৃত্যের মতো,
সংসার দেবে পাহারা ;
চোখেমুখে হেসে বশে রাখবে সে সতত
বাস করে যারা এ-পাড়ায়।
কাকপ্রত্যুষে সাড়া পাব তার জেগে,
প্রস্তুত রাতদিন সে,
আঁধারে পরাবে সরু ফিতে লণ্ঠনে,
আলোয় হবে না হিংসে, এবং
কিছুকে পাবে না ভয় :
দুঃখের দিনে এনে দেবে প্রত্যয়

সে-ই তো আমার সাধ্য শান্তি,
বিশ্বাসী প্রভুভক্ত।
অনেক কালের পুরনো সে-লোক,
পরস্পরের জানি সুখ শোক,
দু'জনের আশা-নেশা-আনন্দ
চিনিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞ সময়।
আমি, সে আমার প্রহরী, উভয়ে
ডরাই লড়াই রক্ত॥

শেষ বি. এন. আর. মেল

পৃথিবীর সব হাওয়া ছিপ ফেলে আড়ে ব'সে আছে,
গড়ালো দুপুর।
কোনো মাছ চারে নেই, খাড়া ছায়া ক্রমে হেলে যায়,
ফিরে আসে দূর
অসীমের উঁচু ডাঙা ঘুরে দেখে ক্লান্তডানা চিল
শিমুলের শীর্ণ ডালে। অতিকায় রোদে মেলা নীল
আকাশে একাকী বড়ো।
পথঘাট শুয়ে আছে, আর
নদীর প্রচ্ছন্ন তীরে ঠোঁট চাটে মুগ্ধ জল,
শোনে তার অভ্যস্ত আহার
উজ্জ্বল রুপোলি বালু অবিরল ঝরে, ঝ'রে যায়।
এখন বিকেল।
জানি না কোথায় তুমি, কে তোমাকে নিয়ে গেল,
নিলো শেষ বি. এন. আর. মেল।

নিমন্ত্রণ

তুমি এসো সখি, বাল্যের সহচরী,
মালা নেই, কিছু নেই প্রেম উপচার,
কল্পান্তের দুর্যোগে ঘর করি,
(ঘরই বা কোথায়? খ'সেছে দেয়াল, দ্বার
জন্মের মতো খুলে গেছে, সহচরি।)

তুমি ব'লেছিলে, সময়ের সেবা-হাত
আরাম করবে হৃদয়ের পীড়া যত!
কালের আপন শিরেই বজ্রাঘাত
হবে যে সে-কথা জানতে না অন্তত।
মূর্ছিত তার শয্যার দিকে চেয়ে
মনে হয় বুঝি কাটবে না কালরাত।

চোখে আলো এনো, হাতে এনো শুশ্রূষা,
হয়তো তাহ'লে শেষ হবে শর্বরী।
আবার আকাশে হাসবে তরুণী উষা
একবার যদি তুমি হাসো, সহচরি।

তুমি কী সুন্দর

তুমি কী সুন্দর তাই ভাবি।
তোমাকেই করা সাজে মর্ত্যলোকে অমরতা দাবি।
তোমার হেমন্ত দূরে, দূরে শীত, আকাশ উজ্জ্বল :
তোমাকে সাজে না করা ছল।
দুরাশা রাখিনি মনে, জীবনের অগণিত ক্ষতি
যদিও সহসা আজ এক ঝাঁক উড্ডীন প্রজাপতি!
যত ক্লেশ, যত ক্লান্তি, ভয়,
যৌবনের যত অপচয়,
সব মিথ্যা অপগত তোমার কারণে একদিন।
তুমি কী সুন্দর, তাই কী সুন্দর আকাশে আশ্বিন।

যে নেই ভেবে

দিন কেটেছে এলোমেলো
ঘুম দিয়েছে রাত :
হার মেনেছি যখন, দেখি
এ-জীবনের অনেক মেকী
আড়াল করে অদৃশ্য কার হাত!
অদৃশ্য কার হাত?

কোনোদিন কি জেনেছিলেম
এ-হাতখানি তারই,
যে নেই ভেবে আকাশখানা
হয়নি ডেকে ঘরে আনা,
হয়নি দেওয়া সাতসাগরে পাড়ি,
সাতসাগরে পাড়ি?

যখন আমার সময় যাবে
যে-পথ দিয়ে যায়
নির্বাপিত গ্রহতারা
আগুনহারা আলোকহারা,
লিখবে সিঁদুর ভোরের আলো
সীমন্ত সীমায়,
জেনেছি, কার সীমন্ত সীমায়॥

কেন

এই ভোর, এই রাত
কার হাতে মুছে যায়!
দিন কাটে ছলনায়,
কোনো প্রত্যাশা নেই।
হায় কেন সব কথা
প্রকাশের ভাষা নেই!
কেন নীল মেঘ ডাকে,
শালবনে হাওয়া হাঁকে,
কেন সব প্রজাপতি উড়ে যায়?

দূরে মর্মরিত বন

ঋতুর, না জীবনের? শেষ বৃষ্টি বুঝি ঝ'রে যায়,
ফুরালো মৌসুমী।
নগরীর জনরোলে
কখনো কি মন ভোলে?
নিদ্রায় উতলা করে
মর্মরিত দূর বনভূমি,
আকাশ দাঁড়ায় পাশে যার,
নদী ঘুরে চ'লে যায়,
দুই তীর ছায়া অন্ধকার।

কেন যে এখানে আছি, মৌসুমীর হলো অবসান।
আমার ইচ্ছার শত্রু, বিশ্বাসঘাতক এই গান
কেন যে শোনাই।
নগরীর জনরোলে
কখনো কি মন ভোলে?
উতলা বুকের রক্তে
অবিশ্রাম যাই যাই যাই।
রাত্রির চোখের জলে
ভেসে যায় যা ছিল, যা হবে।
দূরে মর্মরিত বন
স্বপ্নে হানা দিয়ে যায়,
অন্ধকার ডোবে কলরবে।

ডিওটিমা

(হ্যেল্‌ডারলিন থেকে)

তোমাকে বোঝে না এরা, তিতিক্ষায় স্তব্ধ তুমি তাই
আজ এ-মধুর দিনে, আলোকিত ধরণীর পানে
গরিয়সী তুমি, বৃথা নীরবে তাকিয়ে আছো, যদি
স্বজনের দেখা পাও, যদি আজো থেকে থাকে তারা,
সেই সব নৃপতিরা, যারা ভ্রাতাসম
অথবা সখার মতো, যেমন কাননে তরুশির,
একদিন জেনেছিল প্রেম, জন্মভূমি,
এবং বিচ্ছেদহীন স্বর্গের আশ্লেষ।
এখনো ধেয়াও নাকি তোমার স্পন্দিত বক্ষে
জেগেছিল যারা কৃতার্থেরা?
এমনকি রৌরবেও যেই বিশ্বস্তেরা একদিন
অমলিন আনন্দ এনেছে? মুক্ত যারা,
দেবতা-প্রতিম যারা, নম্র, মহাপ্রাণ, যারা গত?
কেননা বিলাপ প্রাণে থামে না যদ্যপি থাকে
বিলাপের হেতু,
প্রাচীন নক্ষত্র নিত্য যে-ই শোক অনির্বাণ রাখে,
নিবৃত্তি জানে না কভু যে-মৃতের শোক।

কাল তবু নিরাময় আনে, অমর্ত্যেরা
আরো আজ বলীয়ান, দ্রুত।
এ কি নয় প্রকৃতির চির আনন্দিত স্বত্বে অধিকার দাবি?
মৃত্তিকার স্তূপ পুন সমতলে মেশার আগেই
সমাগত কালান্তর, প্রিয়তমা, আমার ক্ষণিক
এ-গানও করেছে লক্ষ ভাবীকাল, তোমারই প্রতিমা
ডিওটিমা,
যবে বীর, দেবতার পাশে অধিষ্ঠিতা।

উইলিয়াম ব্লেক-এর দুটি কবিতা

১. বাঘ

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার,
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিল ওই সুঠাম প্রলয়?

অতল সাগরে, অগম শূন্যে
জ্বলেছিল কি ও-আঁখির বহ্নি?
সে-আগুন নিতে ভ'রে দুই মুঠি
ভর করেছে সে কোন পাখা দুটি?

কত বড়ো কাঁধ, কোন সে যন্ত্রী
গড়েছিল তোর হৃদয়তন্ত্রী?
জাগিয়ে পাঁজরে আদিতম ধ্বনি
কোন বাহুবল, পায়ের বাঁধুনি,

কিসের হাতুড়ি, কেমন শেকল,
মগজ-গলানো কোন দাবানল,
কিসের নেহাই, সাঁড়াশির চাপ
গ'ড়েছিল ওই দারুণ প্রতাপ?

দীর্ঘ বর্শা তারাদের হাতে
খ'সে গেলে, নীল অশ্রুপ্রপাতে
ধুয়ে গেলে, গড়া হ'য়ে গেলে শেষ
সে কি হেসেছিল? তারই রচা মেষ?

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার,
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিল ওই সুঠাম প্রলয়?

২. দিব্য-প্রতিমা

দুঃখ যখন আঘাত করে, সবাই ফেরে খুঁজে
মৈত্রী দয়া করুণা আর ভালোবাসা;
আনন্দময় নিত্যগুণকে জানায় বারে-বারে
ধরণী তার নিবেদনের নম্র ভাষা।

কারণ দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
পরম প্রভু, পরম পিতা, প্রিয়তম।
আবার দয়া ভালোবাসা মৈত্রী করুণাতেই
রচিত তাঁর সত্য মানুষ নিরুপম।

কে করুণা? হৃদয়ে তার হৃদয় মানুষেরই,
দয়ার মুখে এই মানুষের প্রতিকৃতি,
পুণ্য নরদেহেই দ্যাখো ভালোবাসার দেহ,
মরদেহের আঁচল জড়ায় মৈত্রী প্রীতি।

তাই বলা যায়, দুঃখ যখন আঘাত করে বুকে
ভক্তিভরে যে যেখানে নোয়ায় মাথা,
তখন দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
মানুষকে বন্দনা করে, সে-ই বিধাতা।

হোক সে ম্লেচ্ছ, হোক ইহুদী, হোক তুরাণী, তবু
বরণ করো নরদেহের অধীশ্বরে ;
যেথায় দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসা,
আছেন তিনি তাদের সঙ্গে সবার ঘরে॥

১. গোলাবাড়ির গান

গোলা উজাড়, দিন মহাজনের ঘরে :
আমরা যে জাতগেরস্ত, উঠোন খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।
আমরা যে জাতগেরস্ত, পুজোবাড়ি খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।
আজো আশ্বিন প্রাচীন অভ্যাস মতো রোদ পাঠায়
নরম ভর্ৎসনার মতো কড়া,
পাঁচিলে শরীর ঢাকে অকারণ ফুলে ভরা
দুঃখিনী স্থলকমলের গাছটা।
ইটখসা বুড়ি ইঁদারায়
নিয়মিত জল নিতে দাঁড়ায়
টিপ-পরা চুল-বাঁধা বিকেল পাঁচটা।

অথচ গোলা উজাড়, রাত মহাজনের ঘরে :
বিনি আলপনায় উঠোন খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।
আমরা যে জাতগেরস্ত, মাঠবন খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।

২. পদ্মাপারের ডায়েরি থেকে

সন্ধ্যা নামলো বিরলবসত নদীর চরে, এঁকে-বেঁকে
ধোঁয়া উঠলো কাছে-দূরের কুটির থেকে,
এবং ক্রমে আকাশপ্রমাণ শাদা মেঘে
রাত ছড়ালো ঘুমের আলো।

শিশুসবুজ ধানের চারা
হাওয়ায় তাদের আঙুল বাড়ায়,
অন্ধকারেও খেলতে ডাকে,
আমাকে নয়, অন্য কা'কে!

দেখা যায় না, আকাশে কে গ্রহতারার প্রদীপ জ্বালে।
আপনি জ্বলে, না কেউ জ্বালায়?
এখনি রাত গভীর হলো!
এইতো ডুবলো দীপ্ত রবির সোনার থালা!

কখন দেখি প্রশান্ত এক আলোর ধারা
ঝরছে সারা আকাশ থেকে
কৃষাণীদের দাওয়ার 'পরে,
বিশাল সবুজ নদীর চড়ায়
আকাশ থেকে আলো ঝরে,
আলো ঝরায় বোবা রাতের
অন্ধ দুটি চোখের চাওয়ায়
দৈব হাওয়ায়।

এবং কেমন ভয় পায় না খেয়াঘাটের ছোট্ট কুটির একা-একা,
অন্ধকারে নিজের লোককে কী নিশ্চিন্তে আলো দেখায়!

৩. ময়ূরভঞ্জের পথে

তারপর হঠাৎ দূরে নীলপাহাড়ের ছায়া দেখে
হুইসিল দিয়ে ট্রেন থামলো : স্টেশন নয়, প্রান্তর।
কেউ উঠলো না, বরং নামলো
দুটি মিস্ত্রী, তাদের ঝোলা।
অদূরে মহুয়াপাড়ায়
একসার সাঁওতাল দাঁড়ায়,
পাতাছাওয়া কুটিরে দরজা খোলা।
দেখলাম না আছে কি নেই ধানের গোলা।

কপালে টান ক'রে বাঁধা চুল
ভুঁই ফুঁড়ে কখন উঠলো আশ্চর্য একঝাঁক কালো ফুল।
নিরাপদ ফাঁক রেখে এঁকেবেঁকে একটু দূরে থামে
ময়ূরভঞ্জের এক নাম-না-জানা গ্রামে।
জানা হয় না, কেন তন্বী দুইসখী উসখুস ক'রে হাসে
জন্মজন্মান্তরের চৈত্রমাসে।

এঞ্জিনের তন্দ্রা ভেঙে একসময় দুলে ওঠে গাড়ি :
আর একটু দাঁড়ালে হতো, কিছুই ছিলো না তাড়াতাড়ি।

৪. বালেশ্বরের সমুদ্রতীর : ১৯৪২

এইখানে নীল সাগরতীরে হয়তো ছিলো দুর্গপ্রকার
শত জোয়ার ঢেউয়ের ফেনার প্রণাম রাখার।
হয়তো ছিলো সেনাদলের আসা যাওয়া,
আছড়ে-পড়া দেশবিদেশের পালের হাওয়া।
এখন শুধুই ঝাউয়ের সারি,
ঝিনুকঢাকা বালিয়াড়ি,
যেখানে আজ দিনের শেষে
শব্দ আর স্তব্ধ মেশে।
গরিব মেয়ে খুঁজে বেড়ায় শাঁখের কড়ি,
হাঁটুজলে ঢেউয়েরা দেয় গড়াগড়ি।

বেয়াল্লিশের বালেশ্বরে
দিনের শেষে ময়লা জলে ভাঁটা পড়ে॥

৫. আহা লাল ফুল

ফুলেরা হাওয়ায় টলে
ফুলেরা উতলা হয় ভয়ে।
গন্ধহারা বাসি গোলাপের
এলানো পাপড়িগুলি, মলিন পাপড়িগুলি
ধুলোয় ছড়ায়।
আহা ফুল, আহা লাল ফুল।

অপগত আকাশের হিরণ্ময় থালা।
দিনের দুর্জয় সূর্য পশ্চিমের বনে
কুশলী ব্যাধের পাতা জালে ধরা পড়ে।
আর্তনাদ থামে পাখিদের।
তরল শিশুর কণ্ঠ উড়ে যায় নক্ষত্রের ভিড়ে।
এবং নক্ষত্র থেকে চরাচরে ঝরে মৃত্যুভয়।

আহা ফুল, আহা লাল ফুল॥

তাতারসমুদ্র-ঘেরা

(অম্লানের জন্য)

ছড়ানো প্রাণের মেলা, জীবনের মুগ্ধ আনাগোনা :
এ-অলীক আনন্দের শত্রুতা সাধতে পারব না।

কে মন্দ মানুষ, কে বা শাদা কালো—
তাকাও, বিষণ্ণ চোখে আলো জ্বালো,
দ্যাখো প্রাণরঙ্গভূমি, চিনে নাও আত্মপরিজন,
তাতারসমুদ্র-ঘেরা জননী বসুধা একাকিনী,
উদাসিনী ধুলোর প্রাঙ্গণ।
বিদেশী মাল্লার নৌকো ঘাটে-ঘাটে, দেশান্তরী জাহাজের ভিড়।
মরুতে উদ্যান খুঁজে ক্যারাভান ফেলেছে শিবির।
বাজারে বিচিত্র পণ্য, রকমারি মালা বালা কাঠের চিরুনি,
মালসা বা মাটির হাঁড়ি, সাজানো সঙিন আখ—
কিসের ডুগডুগি শুনি?

লো মেলায়, চলো মেলায়,
বলা এলায় মাঠে বনে,
াঙা ধুলো তুলি বুলোয় প্রাণেমনে।

অন্য কোন অপার্থিব খুঁজবে ঊর্ধ্বে নীলিমার শূন্যে?
সবই কি এখানে নেই, আবর্তিত নরনারীর
উদ্গত অশ্রুতে কেনা পুণ্যে?
পাণ্ডাকে অচল সিকি সঁপে উঠবে কোন স্বর্গের সিঁড়ি?
ুয়াড়ীর পাপচক্রে সর্বস্ব খুইয়ে কেন বাড়ি ফিরি?
ন্মনা শীতের রোদ, দূর থেকে বরং দ্যাখো, ভাঙা দেউলের দরজায়।
লাগলি গাঁয়ের মেয়ে দুটি ঘর যায়।
র মধ্যে তুমি আমি সে
ারো অগণ্য অন্য, চিনিনে যাদের, পাইনে দিশে,
ন্দ কি মাঝারি, কি-জানি কেমন, শাদা কালো বাদামী :
শেষের লব্ধ বিস্ময়,
র-বার মনে হয়—
হা, কোথায় আমি!
কেন এলাম? কিসের টানে আসা?

কার কী রেস্ত? কার খোঁজে
খাপছাড়া আড়াল লোকটা ঐ পথিক
চোখ বোজে?
কোন পাপে ঐ বিকলাঙ্গ
ব্যস্ত ভিড় এড়িয়ে হঠাৎ তার যাত্রা করল সাঙ্গ?
জানি না, জানবো না। চলো বরং একদান নাগরদোলায় দুলি।
অন্ধ ভিখিরীর মেয়ে, ভরলো না হয়তো তার
দিনান্তের স্বল্প আশার ঝুলি।
ডুম ডুম নাগারা পিটছে দু-আনা টিকিটের সার্কাস তাঁবু।
পানউলীর সঙ্গে নিভৃত ঠাট্টায় রত পামশুপেরা বাবু।
দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখি, শুকোয় না পটুয়ার তুলি।
উদাসীর ধুনি জ্বলছে, সুমুখে সিঁদুর লেখা
বিমর্ষ মৃতের তিন খুলি!
এরই মধ্যে পকেট কাটছে কেউ,—মূলধন বাড়ায়—
সুখের জংশনে যাবে দ্রুত ট্রেনে, কম ভাড়ায়!

অনিঃশেষ শেষ দেখা, চোখ ফেরে না, এমন, আশ্চর্য
মর্ত্যজীবনের পারম্পর্য।
উত্তমের নিকোনো আঙিনা,
অধমের নোংরা গন্ধ গলি
খোলা চোখের সময় পাই যেন দেখতে সকলই।
মা-মরা শিশুর শুকনো ঠোঁটে কান্নায় ভেজা শস্তা বাঁশি
শুনতে-শুনতে শেষ যেন ঘাটে আসি।
কিংবা যাই পাহাড়ী পাকদণ্ডী বেয়ে দূরে
কুয়াশায় মিশতে, প্রাণরঙ্গভূমির মেলা ঘুরে।
অথবা নামি পাতালের সিঁড়ি বেয়ে তলায়
প্রত্যক্ষ করতে আঁধারের বিখ্যাত কারুকলায়।

তখনো এখানে চলবে দেশদেশান্তরী আনাগোনা।
সাধ নেই, সাধ্য নেই, এ-ক্ষণিক আনন্দের
শত্রুতা সাধতে পারবো না॥

কত কিছু দৈবে ঘটে

কত কিছু দৈবে ঘটে ধরণীর পদপ্রান্তে এসে।
কুটিল নদীর স্রোত পাড়ি-ধসা দুঃস্বপ্নের শেষে
আশার সমুদ্রে মেশে; জনতার মেলা
ধাবমান প্রহরের ডঙ্কা শুনে ভেঙে দেয় খেলা;
সোনার বিকেল পড়ে বসন্তের পাতায় পল্লবে:
সব হবে, মন বলে, আবার আবার সব হবে।

দ্রুত ট্রেন দুদণ্ডের শ্বাস ফেলে স্টেশনে দাঁড়ায়:
জানালায় হাত নেড়ে কে কোথায় দূরে চ'লে যায়,
পিছু ফিরে তাকায় না, যদি চোখ ঘোর হ'য়ে আসে।
দিনান্ত ফেরায় রঙ বীরভূমের আকাশে-আকাশে।

কত কিছু দৈবে ঘটে। খোলা মাঠ, ছনে-ছাওয়া বাড়ি,
রেললাইনের পাশে চীনেচিত্র শিমুলের সারি,
ডোবাতে পল্লীর ছায়া, আসন্ন তিমিরে চেয়ে থাকা
জ্যোতিষ্কের দীপ্ত চোখ চৈতন্যে নিমেষে পড়ে আঁকা।

যদি ফিরে আসা যেতো, ধরণীতে কত দৈব ঘটে!
সমুদ্র-মেখলা মাটি পর্বতে কান্তারে সমতটে
দূরে দূরান্তরে জাগে কত মৃত্যু কত ভালোবাসা?
বুক ভেঙে যায়
আনন্দে বিষাদে বেদনায়।
কী মন্ত্র শেখায়, দ্যাখো, আনন্দিত শালবীথি,
বলে, 'আশা রাখো
জীবনের যত অসম্ভবে।'

সব হবে, মন বলে, আবার আবার সব হবে।

সম্ভাষণ

ওরে ভীরু, ওরে পরম অবিশ্বাসী,
এখনো কি তোর জাগলো না প্রত্যয়?
হৃদয় তোমার এখনো দিলো না সাড়া?
দ্যাখোনি কি তুমি—রাত্রি রয় না খাড়া
প্রত্যূষে কালো পাহাড়ের মতো? যেই
আকাশ পেয়েছে আলোর সুতোর খেই,
দশদিক যেই গেয়েছে দিনের জয়,
যবে সংশয় স্বপ্নের মতো বাসি,
তমসা পোহায়: পোহায় না তব ভয়?
ওরে ভীরু, ওরে পরম অবিশ্বাসী!

জীবন তোমাকে শেখায়নি কোনো গান?
মৃত্যু আনেনি কোনো অভাব্য ক্ষেম?
ঘাতক সময় কুঠারে দেয় কি শান
দিনরাত শুধু তোমাকেই ভেবে? প্রেম
কোনো অসময়ে, প্রভূত ক্লেশের শেষে,
তোমার তপ্ত কপালে রাখেনি হাত?
বিকেলে যখন সন্ধ্যার ছায়া মেশে,
সব কালো চোখে কাজল পরায় রাত,
তৃতীয়ার চাঁদ উঠে আসে নীলিমায়,
নীরবে ঝরায় প্রভু বুদ্ধের হাসি:
বিশ্ব তখনো তোমার অন্তরায়?
ওরে ভীরু, ওরে পরম অবিশ্বাসী!